বাংলা ভাষায় পুরুষালি স্বরের আধিপত্য

পারভীন জলী

ভাষার অন্দরে কী করে পুরুষতান্ত্রিক কর্তৃত্ব বাস করে আর কিভাবে তা নারীর ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে, ভাষার মাধ্যমে উৎপাদিত জ্ঞানে নারীর প্রতি কী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটে ইত্যাদি বিষয়ের বিশ্লেষণ তুলে ধরাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এখানে দেখানো হয়েছে পুরুষতান্ত্রিক বাস্তবতা চলমান রাখতে খোদ ভাষাই কিভাবে মুখ্য শক্তি হয়ে ওঠে।

পারিবারিক জীবনে নারীকে অধস্তন প্রমাণ করার অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম হলো ভাষার নেতিবাচক প্রয়োগ। বাংলাদেশে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বিদ্যমান পুঁজি-প্ররোচিত ক্ষমতার যে আধিপত্য, ভাষাও সেই আধিপত্যের জমিনকে পোক্ত করে নারীকে অধস্তন করার প্রক্রিয়া চলমান রাখায় ব্যবহৃত হয়। ভাষা কখনো তার নির্মিত অর্থ কিংবা কখনো তার নির্মিত জ্ঞানের মাধ্যমে এই আধিপত্য বিস্তারে সক্রিয় থাকে। আবার কখনো খোদ ভাষাই পুরুষতন্ত্রের দাস হয়ে নারীর ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। এ ক্ষেত্রে দেখা যায়, পুরুষতান্ত্রিক ভাবনা ভাষাকে প্রভাবিত করে তার সহায়ক জ্ঞান তৈরি করে। জ্ঞান মানেই যখন ক্ষমতা, তখন পুঁজিবাদী-পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতা-কাঠামোয় ভাষা পুরুষতান্ত্রিক জ্ঞানেরই উৎপাদন ঘটায়। আর তা নারীর জীবনে অধস্তনতা তৈরি করে তার ওপর ভাষিক আধিপত্য বিস্তার করে। পারিবারিক জীবনে নারীকে হেয় প্রতিপন্ন করতে ভাষিক আধিপত্য বিষয়ে আলোচনার সুবিধার্থে প্রথমে ভাষার ধারণা আবশ্যক।

ভাষা কী?

ভাষা ধারণাটির কোনো সুনির্দিষ্ট ও অবিতর্কিত সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন, কেননা যে কোনো কিছুর সংজ্ঞা ভাষার মাধ্যমেই দিতে হয়। তাই ভাষার আত্মসংজ্ঞা প্রদান দুরূহ। তবে ভাষার একটি কার্যনির্বাহী সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায়, ভাষা মানুষের মস্তিষ্কজাত একটি মানসিক ক্ষমতা, যা বাক্য-সংকেতে রূপায়িত হয়ে একই সমাজের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা করে। অর্থাৎ ভাষা হচ্ছে মানুষের মস্তিষ্কজাত মানবীয় ক্ষমতা, যা তাকে সমাজ গঠনে, সমাজ সংরক্ষণে এবং সমাজ বিকাশে সহায়তা করে (মুসা, ১৯৯১: ৩)। ভাষা মানুষে-মানুষে যোগাযোগের প্রধানতম বাহন এবং স্বাভাবিক মানুষ মাত্রই ভাষা অর্জনের মানসিক সক্ষমতা নিয়ে জন্মায়। একবার ভাষার মূল সূত্রগুলো আয়ত্ত করে ফেলার পর বাকি জীবন ধরে মানুষ তার ভাষায় অসংখ্য নতুন নতুন বাক্য সৃষ্টি করে থাকে।

সুতরাং ভাষাকে সহজভাবে সংজ্ঞায়িত করে আমরা বলতে পারি, মানুষের বাগ্‌যন্ত্রসৃষ্ট কতগুলো ধ্বনিমূল, ধ্বনি দ্বারা গঠিত শব্দ, শব্দগুচ্ছের নির্দিষ্ট নিয়মে সজ্জিত হয়ে গঠিত বাক্য এবং বাক্যের মধ্যে প্রবাহিত অর্থসমূহ কোনো সমাজে পারস্পরিক যোগাযোগে ব্যবহৃত হলেই তাকে ভাষা বলা হয়। ভাষাবিজ্ঞানী চার্লস এফ হকেট (১৯৬৮: ৫৬৯) মানুষের এই অনন্যসাধারণ ক্ষমতার কথা বলেছেন তাঁর 'এ কোর্স ইন মডার্ন লিংগুইস্টিকস' গ্রন্থে। এ ছাড়াও বিভিন্নজন ভিন্ন ভিন্নভাবে ভাষার সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। ভাষাবিজ্ঞানী ব্লক ও ট্রাগাররের মতে, *'ভাষা এক স্বেচ্ছাচারী বাকপ্রতীকের অবলম্বন, যার দ্বারা কোনো সামাজিক গোত্র পারস্পরিক যোগাযোগ সম্পাদন করে।'* ভাষাবিজ্ঞানী হুইটনি বলেছেন, *'ভাষা একটি সামাজিক সংস্থা–এ কথার তাৎপর্য দ্বিবিধ, প্রথমত, ভাষার জন্ম সামাজিক প্রয়োজনে, দ্বিতীয়ত, ভাষার প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয় সমাজের কাঠামো অনুসারে'* (রামেশ্বর, ১৯৯২: ৪)।

ভাষাবিজ্ঞানীরা মনে করেন, বর্তমান পৃথিবীতে চার থেকে আট হাজার ভাষা প্রচলিত রয়েছে, যা নানা বিবর্তনের মাধ্যমে পরিবর্তিত বা পরিবর্ধিত হচ্ছে। ভাষার এই বিবর্তন ঘটে পারিপার্শ্বিক নানা কারণ তথা রাজনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে। ভিন্ন ভিন্ন ভাষার রূপবদলের প্রক্রিয়ার মধ্যেও আবার ভিন্নতা রয়েছে। এ সম্পর্কে ভাষাবিজ্ঞানী পটার (১৯৬০ : ১৭-১৮) বলেন :

Some languages are spoken by quite small communities and they are hardly lively to survive ... the languages that remain are constantly changing with the changing needs and circumstances of the people who speak them. Change is the manifestation of life in language.

শুধুমাত্র শরীর বিকোলেই না, সমাজে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করলে, পুরুষতান্ত্রিক অবদমনকে মেনে না নিলে, রাত-বিরেতে চলাচল করলেও বেশ্যা বলার চল আছে আমাদের দেশে। 'বেশ্যা' স্ত্রীবাচক শব্দ এবং এর কোনো পুরুষবাচক শব্দ নেই। অর্থাৎ যে পুরুষ শরীর বিকোয়, রাত-বিরেতে চলাফেরা করে, এমনকি বহুগামী হয়, তার জন্য 'বেশ্যা'র সমার্থক কোনো শব্দ নেই।

নারী-পুরুষভেদে ভাষাভিন্নতার সঙ্গে সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবকাঠামো বিশেষভাবে জড়িত। এ বিষয়ে ড. রাজীব হুমায়ুন বলেন, *'শুধু শারীরিক ভিন্নতার কারণে নারী-পুরুষের ভাষায় বৈচিত্র্য আসেনি। ভাষাবৈচিত্র্যের পেছনে রয়েছে সামাজিক বিধি-নিষেধ, নারীদের মানসিকতা, পুরুষশাসিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ও অন্যান্য জটিলতা'* (হুমায়ুন, ১৯৮৫: ৫০)।

অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন ভাষা একান্তই একটি মানবিক বৈশিষ্ট্য; মানুষ ছাড়া আর কোনো প্রাণী এই ক্ষমতার অধিকারী নয়। ভাষা এমন এক মাধ্যম, যার দ্বারা ব্যক্তির আবেগ, অনুভূতি, চিন্তা, ক্রোধ ইত্যাদির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। পক্ষান্তরে ভাষার জোরেই মানুষকে খুব সহজে কাবু করা যায়। আবার ভাষার ইতিবাচক ব্যবহারে নারীর অধস্তনতা দূরীভূতও করা যায়। এ প্রসঙ্গে ফুকো বলেন, *'যে কোনো অবদমনের অবস্থা পরিবর্তনে মানুষের ভাষা ও আচারানুষ্ঠান ভয়ংকর ক্ষমতাশালী'* (উদ্ধৃত, হার্টসক, ১৯৮৭)। এ কারণেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অনেক সময় নারীকে অধস্তন করে রাখার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয় ভাষা।

অন্যান্য ভাষার মতো বাংলা ভাষার প্রয়োগেও রয়েছে বৈষম্য। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সাধারণভাবে পুরুষের ভাষা-ব্যবহারকে

পেশল, দৃঢ় ও শক্তিশালী, আর নারীর ভাষাকে দুর্বল, কোমল ও নরম হওয়ার আশা করা হয়। ভাষা যদিও নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির নির্মাণ নয়, তবু এই সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নিজস্ব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় এর নেতিবাচক ব্যবহার চলছে অবলীলায়। অনেক ক্ষেত্রে নারীও এতে ইন্ধন জোগায়, আর পুরুষ তা আধিপত্যবাদী শক্তির বলে জিইয়ে রাখে। আর এভাবেই নারীর অধস্তনতা প্রমাণে ভাষার নেতিবাচক প্রয়োগের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হচ্ছে।

মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর অধস্তনতার স্বরূপ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

Nature intended women to be our slaves, they are our property, we are not theirs, they belong to us, just as a tree that bears fruit belong to gardener. What an idea to demand equality for women! ...Women are nothing but machines for producing child (উদ্ধৃত, *হোসেন*, ১৯৯৯: ১১১).

ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টের বহুল আলোচিত এ উক্তিটি পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী কতটুকু অধস্তন তা খুব সহজেই প্রমাণ করে। নারীর ভাষাকে যে প্রাচীনকাল থেকেই দুর্বল ও অন্ত্যজ করা হয়েছে, এর প্রমাণ পাওয়া যায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসবিদ সুকুমার সেনের বক্তব্যে। তিনি বলেন :

Traces of sex dialect in oldest Indo-Aryan (Vedic) are exceedingly scares, owing, no doubt, to the sacred and religious character of its literature (সেন, ১৯৭৯: ৩).

একটি সমাজে নারীর মূল্যায়ন কেমন তা সেই সমাজের ভাষা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। আমাদের ভাষায় নারীকে দুর্বলভাবে উপস্থাপনের জন্য 'নরম', 'কোমল', 'লজ্জাবতী' শব্দসমূহ আমরা প্রায়ই ব্যবহার করি। আবার একজন নারীকে তার স্বামী নাম ধরে ডাকতে পারলেও স্ত্রীর ক্ষেত্রে তা 'ওগো', 'শুনছো' ইত্যাদি শব্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। নারীর বাক্‌স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও সীমানাচিহ্ন এঁকে দেয় পুরুষ। ভাষা ব্যবহৃত হয় নির্যাতনের হাতিয়ার ও প্রকাশ হিসেবে। এ প্রক্রিয়ায় অনেক ক্ষেত্রে নারীরাও ভূমিকা পালন করে।

নারীকে সৌন্দর্য, ধৈর্য, মমতা ও কোমলতার সংমিশ্রণে আদর্শরূপে চিত্রিত করার প্রয়াস। প্রবাদ-প্রবচন ও ছড়ায় পুরুষ যখন প্রমাণিত হয় প্রত্যক্ষ, শক্তিমান ও বিজয়ী হিসেবে, তখন নারীকে দেখানো হয় অপ্রত্যক্ষ, অবলা ও অসহায়রূপে।

নারীর ভাষা ক্ষমতাহীনের ভাষা (powerless language), পুরুষের ভাষা প্রভাবশালী (dominant), নারীর ভাষা পুরুষের প্রতি আনুগত্যসূচক (subordinate) (ল্যাকফ, ১৯৭৫: ১০)। সাধারণভাবে দেখা যায়, পারিপার্শ্বিক সমাজব্যবস্থা নারীর জন্য এমন পরিবেশ তৈরি করে যে নারী শিশুকাল থেকেই নিজেকে দুর্বল ও অসহায় ভাবতে থাকে, যা তার ভাষায়ও প্রভাব ফেলে। এ সম্পর্কে Tannen-এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 'নারীর কথা নৈকট্য ও বন্ধুসূচক, পুরুষের কথা তথ্য বা বিবৃতিমূলক (rapport talk) (ট্যানেন, ১৯৯০: ৮৫)

নারীর অধস্তনতা প্রমাণে শব্দের ব্যবহার

ভাষায় সামাজিক, অর্থনৈতিক পদমর্যাদা, অবস্থান উপস্থাপন করতে পরিচয় তৈরি করে শব্দ। যেমন– 'রাজা' শব্দটি দ্বারা রাজ্যের প্রধান, 'দাসী' দ্বারা অধস্তন ব্যক্তি এবং 'পতিতা' শব্দটি দ্বারা সমাজের চোখে নিগৃহীত নারীর অবস্থান প্রতিভাত হয়। নারীর স্বাতন্ত্র্য রুখতেও ব্যবহার করা হয় নানা শব্দ; যেমন– বিবাহিত নারীকে দুর্বল প্রমাণ করতে 'বেগম', বিধবা নারীর ক্ষেত্রে 'বেওয়া'। অন্যান্য ক্ষেত্রে 'অবলা', 'লজ্জাবতী', 'কোমলমতি', 'আঁটকুড়ে', 'কুটনি' এবং প্রতিবাদী নারীর ক্ষেত্রে 'বেহায়া', 'লক্ষ্মীছাড়া' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া 'মসলা', 'ফাটাফাটি জিনিস', 'মাল', 'সেক্সি' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করে একজন নারীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত প্রতিটি অঙ্গে যৌন আবেদন খুঁজতে চায় ব্যাটা প্রকৃতির পুরুষ। উল্লিখিত প্রতিটি শব্দ দ্বারাই নারীকে অধস্তন ও হীন করার চেষ্টা চলে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীকে অধস্তন করে রাখতে সুকৌশলে ব্যবহৃত হয় এসব শব্দ। আর এভাবে একেকটি শব্দ, বাক্য হয়ে ওঠে নারী দমনের একেকটি হাতিয়ার।

পুরুষের ক্ষমতার প্রতীক শব্দ

সচরাচর চোখে পড়ে এমন একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেই। ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের পল্লি অঞ্চলের সর্বনিম্ন প্রশাসনিক একক (হোসেন ও মাসুদুজ্জামান, ২০০৬: ২০৩)। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের অনেক ইউনিয়নেই নারীরা 'চেয়ারম্যান' পদে সরাসরি নির্বাচন করেন ও জয়ী হন। কিন্তু তাঁকে আলাদাভাবে শনাক্ত করার জন্য কোনো আলাদা সম্বোধনসূচক পদ তৈরি হয়নি। আমরা জানি 'চেয়ার' ক্ষমতার প্রতীক এবং ইংরেজি 'ম্যান' শব্দের অর্থ পুরুষ। অর্থাৎ চেয়ারম্যান শব্দটি একজন পুরুষের ক্ষমতাকে ইঙ্গিত করে। অর্থাৎ পুরুষতন্ত্র কখনোই ভাবতে পারেনি যে কোনো নারী ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে। তাই 'ক্ষমতার মালিক পুরুষ'–এই ধারণাকে শাশ্বত ধরে নিয়েই ইউনিয়ন পরিষদের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তিকে সম্বোধনের ব্যবস্থা করেছে 'চেয়ারম্যান' হিসেবে। অন্যদিকে পরিষদে কোনো নারী চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করলেও তাঁকে সম্বোধন করা হয় 'মহিলা চেয়ারম্যান' নামে, যা অর্থহীন। 'চেয়ারম্যান' শব্দের প্রায়োগিকতা দেখে মনে হয়, 'চেয়ারম্যান' পদটি শুধুমাত্র পুরুষেরই প্রাপ্য। নারীও যে খুব সহজেই এ দায়িত্ব পালন করতে পারে তা যেন সকলের ভাবনার অতীত।

এবার রাষ্ট্রের সর্বনিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তরের দিকে দৃষ্টি দিলে অবাক হয়ে আমরা আবিষ্কার করি, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদকে বলা হচ্ছে 'রাষ্ট্রপতি', যা ইংরেজি President শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ। লক্ষ করলে দেখা যায়, President শব্দটিতে কোনো লিঙ্গগত বৈষম্য নেই, অথচ যখনই এর বাংলা প্রতিশব্দ করা হলো, তখন তা দাঁড়াল 'রাষ্ট্রপতি'। আমরা জানি, 'পতি' শব্দের অর্থ পুরুষ বা স্বামী। তাহলে কি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদটি শুধুমাত্র একজন পুরুষের জন্যই? একজন নারী নিজ যোগ্যতা ও ক্ষমতাবলে এই পদে আসীন হলে তাঁর পদবি কী হবে? তাহলে কি তাঁকে বলা হবে মহিলা রাষ্ট্রপতি? এ ধরনের ভাষিক দ্ব্যর্থকতা বা বিষমতা কি নারীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া অধস্তনতা নয়?

'বেশ্যা' শব্দটির লিঙ্গান্তর কী?

'বেশ্যা' শব্দটি বৈশ্য শব্দ থেকে এসেছে। বর্ণপ্রথার সময় হিন্দু ব্যবসায়ী শ্রেণিকে বলা হতো বৈশ্য। সেখান থেকে বিকৃতির মাধ্যমে বাংলা 'বেশ্যা' শব্দটির সৃষ্টি। বর্তমানে শব্দটির ভিন্ন অর্থ চলমান, যা কালের পরিক্রমায় নির্মিত হয়েছে। বর্তমানে 'বেশ্যা' শব্দটির অর্থ হলো: যে নারী শরীর বিক্রি করে। তবে শুধুমাত্র শরীর বিকোলেই না, সমাজে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করলে, পুরুষতান্ত্রিক অবদমনকে মেনে না নিলে, রাত-বিরেতে চলাচল করলেও বেশ্যা বলার চল আছে আমাদের

দেশে। 'বেশ্যা' স্ত্রীবাচক শব্দ এবং এর কোনো পুরুষবাচক শব্দ নেই। অর্থাৎ যে পুরুষ শরীর বিকোয়, রাত-বিরেতে চলাফেরা করে, এমনকি বহুগামী হয়, তার জন্য 'বেশ্যা'র সমার্থক কোনো শব্দ নেই। তাহলে মানে কি এই দাঁড়ায় যে শরীরী শুদ্ধতা কেবল নারীদেরই বিষয়? পুরুষের শরীরকে শুদ্ধ হতে হয় না? 'পতিতা' শব্দের সমার্থক অর্থ করা আছে: বেশ্যা, বনিতা, বারবনিতা। কিন্তু এই শব্দগুলোর কোনোটিরই কোনো পুরুষবাচক সমার্থক শব্দ নেই। ভাষার এই চরিত্র নারীর প্রতি আধিপত্য বিস্তারেরই নামান্তর।

সতীত্ব কি কেবল নারীর একার বিষয়?

পারিবারিক জীবনে ভালো নারীর সমার্থক হিসেবে 'সতী' শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। বাংলা একাডেমির অভিধানে 'সতী' শব্দটির অর্থ করা আছে: সাধ্বী, পবিত্র, স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষে আসক্ত নয় এমন, হিন্দু পুরাণের দক্ষ কন্যা, শিবানী, স্বামীর মৃত্যুতে সহগামিনী স্ত্রী ইত্যাদি। অর্থাৎ যে নারী তাঁর স্বামী ব্যতীত অন্য কোনো পুরুষে আসক্ত নন, এমনকি তাঁর স্বামীর সঙ্গে চিতায় যাওয়ার জন্য নির্দ্বিধায় প্রস্তুত–তিনিই কেবলমাত্র সতী। এর বাইরে নারী নিজের মতো জীবন যাপন করলে, স্বাধীনভাবে কাজ করতে চাইলে, অন্যের চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্ত না মেনে নিজের ইচ্ছার গুরুত্ব দিলে, সমাজ তার বিরুদ্ধে যে সকল কুৎসা রটায়, তার মধ্যে 'অসতী' অন্যতম। অর্থাৎ সতী নারী হতে হলে নারীর জীবন স্বামীর ভালো-মন্দ, এমনকি মৃত্যুর সাথেও জড়িত রাখতে হবে; তার নিজের কোনো অস্তিত্ব থাকা চলবে না। অন্যদিকে যে স্বামী অন্য পুরুষে আসক্ত, স্ত্রীর মৃত্যুতে তাঁর সহযাত্রী হন না, একাধিক স্ত্রীর সাথে সংসার করেন, তাঁদের জন্য 'অসতী'র সমার্থক কোনো শব্দ খুঁজে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ 'সতীত্ব' শব্দটির কোনো পুরুষবাচক শব্দ অভিধানে খুঁজে পাওয়া যায় না, এমনকি এর কোনো প্রায়োগিকতা ও প্রাসঙ্গিকতাও যেন নেই। তাহলে এটা স্পষ্ট, সতীত্ব শুধুই নারীর একার বিষয়!

'পূর্বনারী' শব্দের অস্তিত্ব নেই কেন?

পুঁজিতান্ত্রিক-ব্যক্তিগত সম্পত্তির যুগে 'পূর্বপুরুষ' নামের একটি শব্দ থাকলেও 'পূর্বনারী' বলে অভিধানে কোনো শব্দ নেই। ১০ মাস নারীর নিজের শরীরের মধ্যে আরেকটি শরীরকে একটু একটু করে বাড়িয়ে তোলা এবং অধিকাংশ দায়-দায়িত্ব পালন করার পরও প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় তার সাথে প্রথম অনুভূতির বিনিময় যে শিশুর, সে শিশুর 'পূর্বনারী' নেই, সে শিশুর নেই কোনো নারীক্রম! সে শিশু কেবলই পুরুষের পরিচয়ে পরিচিত।

আমাদের সমাজে যেসব পুরুষ স্ত্রীর মতকে প্রাধান্য দেয়, তাদের অপমানিত করতে বলা হয় 'স্ত্রৈণ', অথচ একজন স্ত্রী তার স্বামীর প্রতি বাধ্য থাকলে তাকে সম্মান করে বলা হয় 'পতিভক্ত'। অর্থাৎ একজন স্ত্রীর জন্য তার স্বামীর কথা শোনা সম্মানজনক হলেও স্বামীর জন্য তা অসম্মানজনক।

এখানে অভিধানের বিভিন্ন স্থানে মেয়েলি আর পুরুষালি শব্দের অর্থের মধ্য দিয়ে নারী ও পুরুষের প্রকৃতিগত ভিন্নতার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই আমরা যখন দেখি কোনো ছেলে কোমল আচরণ করছে কিংবা এমন কিছু করছে, যার সাথে নারীর স্বভাবের মিল রয়েছে, সেই স্বভাবকে 'মেয়েলি' স্বভাব বলে উপহাস করা হয়। আবার অন্যদিকে মেয়েরা যদি বাইরে চলাফেরা করে, তর্ক করে, জোরে হাঁটে, সোজা কথায় পুরুষতান্ত্রিকতাকে অস্বীকার করে, তখন তার স্বভাবকে 'পুরুষালি' স্বভাব বলে গালি দেওয়া হয়।

'গৃহিণীপনা' শব্দের পুরুষবাচক শব্দ কী?

আমরা জানি, পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় গৃহের কাজকে কেবলমাত্র নারীর একার দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করা হয় আর তাই 'গৃহিণীপনা'র মতো শব্দগুলো অভিধানে থেকে যায়। গৃহস্থালির কাজে নিয়োজিত পুরুষকে প্রকাশ করতে অর্থপূর্ণ কোনো শব্দের হদিসও অভিধানে পাওয়া যায় না। আবার গৃহের কাজের সকল দায়িত্ব নারীর ওপর বর্তালেও গৃহের প্রধান থেকে যায় একজন পুরুষ।

নারীর অধস্তনতা প্রমাণে প্রবাদ-প্রবচন ও ছড়ার ব্যবহার

প্রবাদ-প্রবচন ও ছড়া বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধকারী গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বাংলা ভাষায় অসংখ্য প্রবাদ-প্রবচন ও ছড়া প্রচলিত রয়েছে। এসবের মাধ্যমে যেমন বিভিন্ন সময়ের মানুষের বিভিন্ন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়, ঠিক তেমনিভাবে সে সমাজে নারীর অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কেও জানা যায়। আমাদের সমাজে প্রচলিত নানা প্রবাদ-প্রবচন ও ছড়ায় প্রায়শই নারীর অস্তিত্ব ও সত্তাকে অধস্তন করে স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। এতে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে দেখা যায় নারীকে সৌন্দর্য, ধৈর্য, মমতা ও কোমলতার সংমিশ্রণে আদর্শরূপে চিত্রিত করার প্রয়াস। প্রবাদ-প্রবচন ও ছড়ায় পুরুষ যখন প্রমাণিত হয় প্রত্যক্ষ, শক্তিমান ও বিজয়ী হিসেবে, তখন নারীকে দেখানো হয় অপ্রত্যক্ষ, অবলা ও অসহায়রূপে। স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণের এ প্রক্রিয়ায় কেউ হয় যন্ত্র আর কেউবা যন্ত্রী। এ ক্ষেত্রে মল্লিকা সেনগুপ্তের বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন–

স্ত্রীলিঙ্গের সামাজিক নির্মাণ ঘটে স্ত্রীজাতিকে দমিয়ে রাখার জন্যই। নারী হয়ে ওঠার সেই প্রক্রিয়া সেই স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ আজও, এখনও চলছে পূর্ণশক্তিতে (সেনগুপ্ত, ১৯৯৪:১৪)।

প্রবাদ-প্রবচন ও ছড়াও কখনো কখনো এই স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণে নানাভাবে ইন্ধন জোগায়। যেমন–

ছিরিও নাই ছাঁদও নাই (সিকদার ও নাসরীন, ২০০৯: ১২৫)।

এখানে 'ছিরি' ও 'ছাঁদ' শব্দ দুটির অর্থ হলো রূপ ও গুণ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় গুণের চেয়ে রূপসর্বস্ব নারীর প্রাধান্যই বেশি। বিয়ের ক্ষেত্রে দেখা যেত এবং এখনো দেখা যায়, পুরুষের সৌন্দর্য নিয়ে কোনো প্রকার মাথা ঘামানো না হলেও নারীকে হেঁটে, দাঁত দেখিয়ে, চুল দেখিয়ে তার সৌন্দর্যের পরীক্ষা দিতে হয়। কিন্তু একজন পুরুষের বেলায় এ ধরনের কোনো শর্তই খাটে না। আবার 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র একটি প্রবাদের মাধ্যমে নারীকে সংসারে সকল প্রতিকূলতার জন্য দায়ী করা হয়েছে এভাবে–

সানঝা বেলা যেবা নারী গিরহে দেয় না বাতি
লক্ষ্মীদেবী উইঠা বলে তার কপালে লাথি (পূর্বোক্ত: ১২২)

যেন সন্ধ্যাবাতি জ্বালানোর দায়িত্ব নারীর একারই। প্রকৃতপক্ষে এর মাধ্যমে নারীকে দ্রুত ঘরে ফেরার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। স্বামী যখনই ঘরে ফিরুক না কেন, স্ত্রী যেন সন্ধ্যার পূর্বেই ঘরে অবস্থান করে অর্থাৎ সংসারে সময়-নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করে– এ নির্দেশনাই ওপরের প্রবাদে দেখা যায়।

শুধুমাত্র কন্যা বা স্ত্রী হিসেবেই নয়, নারীর অন্যান্য পরিচয়ও অধস্তন করা হয়েছে নানা প্রবাদ-প্রবচনে; যেমন– মামি চরিত্রটিকে প্রায়শই নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয়। মামার বাড়িতে কেউ বেড়াতে

গেলে যদিও আপ্যায়নসংক্রান্ত সকল দায়িত্বই পালন করে মামি, তথাপি ভাগ্নে-ভাগ্নির আপ্যায়নের কৃতিত্ব সমাজ মামাকেই দেয়। অথচ রান্নাঘরে সাধারণত মামারা প্রবেশ করে না এবং আপ্যায়নের কোনো দায়িত্বই পালন করে না। কিন্তু যে মামি রান্না করা থেকে আপ্যায়ন পর্যন্ত সকল দায়িত্ব পালন করে, তাকে উপস্থাপন করা হয় এভাবে–

তাই তাই তাই মামা বাড়ি যাই
মামা দিল দুধভাত পেট ভরে খাই,
মামি এল লাঠি নিয়ে পালাই পালাই।[১]

উপর্যুক্ত প্রবাদে মামিকে লাঠিহাতে একটি রুদ্রমূর্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে, যা দেখে শিশুরা ভয় পায় এবং পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। পক্ষান্তরে মামাকে প্রমাণ করা হয়েছে মহৎ ও দয়াবান হিসেবে। এ ধরনের ছড়া ছেলে বা মেয়েবেলা থেকেই ঢুকিয়ে দেওয়া হয় বাচ্চাদের মস্তিষ্কে। অন্যদিকে পুরুষের বহুবিবাহের কোনো প্রকার প্রতিবাদ পরিলক্ষিত না হলেও বহুবিবাহের দায়ও নারীর ওপর চাপিয়ে দিয়ে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। যেমন–

হতাই মার বাণী,
তলে দিয়া গাছ কাটে
উপরে ঢালে পানি।[২]

শুধুমাত্র সামাজিকভাবেই নয়, শারীরিকভাবেও পুরুষ নারীকে অধস্তন করে রাখতে চায়। জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর 'দ্য সাবজেকশন অব উইমেন' শীর্ষক গ্রন্থে দেখিয়েছেন, কিভাবে পুরুষ শারীরিক শক্তিবশত নারীকে নিজের অধীন করে রেখেছে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদিও দাস-প্রভু সম্পর্কের পরিবর্তে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকা উচিত, কিন্তু আমাদের সাহিত্যের নানা প্রবচনে স্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে শারীরিক নির্যাতনের পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, 'ঝি'-এর চেয়ে 'বউ'য়ের প্রতি বেশি অমানবিক হওয়ার ইন্ধনও এতে স্পষ্ট। যেমন–

ঝি জব্দ কিলে, বউ জব্দ শিলে,
পাড়াপড়শি জব্দ হয় চোখে আঙ্গুল দিলে
(সিকদার ও সালমা নাসরীন, ২০০৯: ১৮)।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় একজন পুরুষ নিজেকে সমাজের নিয়ন্ত্রক, সিদ্ধান্তগ্রহীতা ও আধিপত্য বিস্তারকারী হিসেবে দেখে। পক্ষান্তরে নারীকে বিবেচনা করে পুরুষের উপভোগের বস্তু হিসেবে। তাদের এ চিন্তার প্রতিফলন দেখা যায় নানা প্রবাদে। একটি প্রবাদে বলা হয়–

নারী হলো ঘরের শোভা, বাইরে তারে মানায় না
শোনো শোনো মা বোনেরা, ঘরই তোমার ঠিকানা।[৩]

অন্য এক প্রবাদে বলা হয়–

বেড়া দিলে বাড়ি, সাজলে গুজলে নারী।[৪]

প্রবাদ দুটিতে নারীকে ঘরের আসবাবপত্রের শামিল করা হয়েছে। তাকে অন্তঃপুরের বাসিন্দা করে রাখার চেষ্টা চালানো হয়েছে কৌশলে। আমাদের সমাজে যেসব পুরুষ স্ত্রীর মতকে প্রাধান্য দেয়, তাদের অপমানিত করতে বলা হয় 'স্ত্রৈণ', অথচ একজন স্ত্রী তার স্বামীর প্রতি বাধ্য থাকলে তাকে সম্মান করে বলা হয় 'পতিভক্ত'। অর্থাৎ একজন স্ত্রীর জন্য তার স্বামীর কথা শোনা সম্মানজনক হলেও স্বামীর জন্য তা অসম্মানজনক।

নারীর অধিক কর্মদক্ষতাকে নিরুৎসাহ করতেও ব্যবহৃত হয়েছে প্রবাদ, প্রবচন ও ছড়া। যেমন–

অতি বড় ঘরনী না পায় ঘর
অতি বড় সুন্দরী না পায় বর।[৫]

অন্যদিকে নারীকে পশুর সাথে তুলনা করে বলা হয়, 'অভাগার গরু মরে ভাগ্যবানের বউ মরে।' অর্থাৎ গরু মারা গেলে কৃষকের কাজ বাধাগ্রস্ত হবে তাই সে আভাগা, কিন্তু স্ত্রী মারা গেলে স্বামী পুনরায় বিয়ে করতে পারবে তাই সে ভাগ্যবান। নারীকে বিধি-নিষেধের জালে আটকে রাখতে বলা হয়–

খটমটিয়ে হাঁটে নারী, কটমটিয়ে চায়
মাস খানেকের ভিতর তার সিঁথির সিঁদুর যায়।
অথবা
রান্ধিয়া বাড়িয়া যেই নারী আউলিয়া রাখে কেশ
তাহার বাড়ির লক্ষ্মী পালায়, পাগলের বেশ।[৬]
অথবা
নষ্ট নারীর বড় গলা
শুনতে কান ঝালাপালা।
এবং
রান্ধিয়া বাড়িয়া নারী পুরুষের আগে খায়
তার পতি সভায় গেলে চড় থাপ্পড় খায়।
চাপড় যায় ভেসে, ছেলে থাকুক বেঁচে।[৭]

পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মা ও মেয়ে এবং শাশুড়ি ও বউয়ের মধ্যকার সম্পর্ক তিক্ত করার প্রয়াসে বলা হয়,

মায়ের পেটে ভাত নাই বউয়ের গলায় চন্দ্রহার।
কিংবা
ঝিয়ে চায় বর, মা চায় ঘর
মা মরে ঝিয়ের তরে
ঝি মরে স্বামীর তরে।

নারীকে ছলনাময়ী, মায়াবতী ও অবিশ্বাসী হিসেবে প্রমাণ করার প্রয়াসে বলা হয়–

নদী, নারী, শৃঙ্গধারী
এই তিনে বিশ্বাস না করি
(সিকদার ও নাসরীন, ২০০৯: ১২৮)।

পুরুষতন্ত্র মনে করে, নারী পুরুষকে ছলাকলায় ভুলিয়ে রাখতে ভালোবাসে। ঠিক যেমন নদী যে কোনো সময় তার গতিপথ পরিবর্তন করতে পারে, একজন নৃপতি যে কোনো সময় রাজ্য জয়ের লক্ষ্যে আক্রমণ করতে পারে, নারীও তেমনি। এখানে গতি পরিবর্তন করা নদী ও মতি পরিবর্তনকারী নৃপতির সাথে তুলনা করে নারীর চরিত্রকে আস্থাহীন করার অপপ্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে নারীর সংঘবদ্ধ শক্তিকে বিনাশ করার চেষ্টায় তাদেরকে কলহপ্রিয় বলে শনাক্ত করা হয়েছে নিম্নোক্ত প্রবাদে–

তিন মাইয়া যেখানে কাজীর দরবার সেখানে।

এভাবে নানা প্রবাদ-প্রবচন ও ছড়ায় প্রায়শই নারীকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টা দেখা যায়।

আমরা জানি, নারী ও পুরুষ শারীরিক পার্থক্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে ঠিকই, তবে যোগ্যতা বা মর্যাদার পার্থক্য নিয়ে নয়। প্রকৃতপক্ষে

পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এ বৈষম্য সৃষ্টি করে। এ প্রসঙ্গে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, *'বিশ্বপিতা স্ত্রী ও পুরুষের কেবল আকারগত কিঞ্চিৎ ভেদ সংস্থাপন করিয়াছেন, মানসিক শক্তি বিষয়ে কিছুই ন্যূনাধিক্য স্থাপন করেন নাই'* (সেনগুপ্ত, ১৯৯৪: ২০)।

প্রবাদ-প্রবচনের পাশাপাশি প্রচলিত বিভিন্ন ব্রতেও নারীকে পুরুষের অংশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সকল ব্রতে নারীর স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে বাঁচার আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তে পুরুষের অনুগামী হওয়ার বাসনা প্রকাশ পেয়েছে। ব্রতগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হলো–

এবার মরে মানুষ হব, বামন কুলে জন্ম নেব
এবার মরে মানুষ হব, সীতার মতো সতী হব
এবার মরে মানুষ হব, রামের মতো পতি পাব
এবার মরে মানুষ হব, লক্ষীন্দরের মতো দেবর পাব।
এবার মরে মানুষ হব, দশরথের মতো শ্বশুর পাব
এবার মরে মানুষ হব, কৌশল্যার মতো শাশুড়ি পাব।
এবার মরে মানুষ হব, লবকুশের মতো পুত্র পাব
এবার মরে মানুষ হব, দ্রৌপদীর মতো রাঁধুনী হব।[৮]

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একজন নারীর নিজের জন্য যেন কিছুই করার নেই। এই বোধ মেয়ে বা ছেলেবেলা থেকেই নারীর মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, নারীর জন্মকে পর্যন্ত অর্থহীন মনে করা হয়। যেমন–'কৃপং দুহিতা, জ্যোতিই, পুত্রঃ পরমে ব্যোমেন' (তর্করত্ন, ১৯৯৩: ২৪৮) । অর্থাৎ কৃপণ হতভাগার জন্য কন্যাসন্তান আর ভাগ্যবানের জন্য পুত্রসন্তান। মহাভারতের বর্ণনায় আছে, নারী অশুভ ও সকল অমঙ্গলের হেতু। নারীর যেন কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই, নেই স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার। সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছানুসারে নারী এসেছে নির্ভরশীল সত্তা হিসেবে। সুতরাং,

পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্তা রক্ষতি যৌবনে,
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা, নঃস্ত্রী স্বাতন্ত্রমর্হতি (পূর্বোক্ত)।

তদুপরি তৈত্তিরীয় সংহিতায় বলা হয়েছে, 'সর্ব গুণান্বিতা নারী অধমতম পুরুষ থেকেও হীন' (আজাদ, ২০০১: ৩২)। মনুসংহিতায় মেয়েদের ব্যাপারে পুরুষদের নানাভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, *'অন্য নারীর সঙ্গে তো নয়ই, নিজের মায়ের সঙ্গেও নির্জন স্থানে যাবে না। কেননা মেয়েদের স্বভাবেই রয়েছে পুরুষকে প্রলুব্ধ করবার প্রবণতা। বোকারা তো বটেই, জ্ঞানীরাও নিরাপদ নয়'* (মিশ্রা, ১৯৮২: ৪২)। অর্থাৎ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীকে আস্থাহীন প্রমাণের পাশাপাশি তাকে কেবলমাত্র মা, কন্যা, বধূ–এই পরিচয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চায়; আর এই অধস্তন করার প্রক্রিয়ায় ভাষার নানাবিধ নেতিবাচক ব্যবহার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

অথচ বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে, 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবে না'(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৮: ৮)। পাশাপাশি সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা ১৯৪৮-এর ২ ধারায় বলা হয়েছে–

যে কোন প্রকার পার্থক্য যথা : জাতি, গোত্র, বর্ণ, নারী, পুরুষ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা মতবাদ, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্য মর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেকেই ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত সকল অধিকার ও স্বাধিকারে স্বত্ববান।

কিন্তু বাস্তবে এর প্রয়োগ নেই বললেই চলে।

শেষকথা হলো, নারী ও পুরুষের শারীরিক পার্থক্য থাকলেও চিন্তা করার ক্ষমতায় বা যোগ্যতায় কোনো প্রকার পার্থক্যের প্রমাণ নেই। তাই সমতা ও মর্যাদার সমাজ গড়তে নারীর প্রতি ভাষিক আধিপত্য উন্মোচন করতে হবে; নারীকে অধস্তন করে রাখার প্রক্রিয়ায় শব্দ, বাক্য তথা ভাষার নেতিবাচক ব্যবহারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।

পারভীন জলী: শিক্ষক, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
ইমেইল: arvin.joll@yahoo.com

পাদটিকাঃ

১ ও ২. সাক্ষাৎকার (মাঠ পর্যায়): কথ্য ইতিহাস বা প্রবাদ সংগ্রহ, রাবেয়া বেগম, নারান্দিয়া ইউনিয়ন, টাঙ্গাইল জেলা

৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭. সাক্ষাৎকার (মাঠ পর্যায়): কথ্য ইতিহাস বা প্রবাদ সংগ্রহ, করিমন বেওয়া, নারান্দিয়া ইউনিয়ন, টাঙ্গাইল জেলা।

৮. সাক্ষাৎকার (মাঠ পর্যায়): কথ্য ইতিহাস বা প্রবাদ সংগ্রহ, রাবেয়া বেগম, নারান্দিয়া ইউনিয়ন, টাঙ্গাইল জেলা।

তথ্যসূত্র

[ট্যানেন] Tanen, D. "You Just Don't Understand" in Women and Men in Conversation, Ballantine books, New York 1990, p 85.

[পটার] Potter, Simeon (1960), Language in the Modern World, Baltimore, USA: Penguin Books.

মুসা, মনসুর (১৯৯১), ভাষাচিন্তা: প্রসঙ্গ ও পরিধি, ঢাকা: বাংলা একাডেমী ৩।

রামেশ্বর, শ' (১৯৯২), সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা, কলকাতা: পুস্তক বিপণি।

[ল্যাকফ] Lakoff, Robin Tolmach (1975), Language and Women's Place: Text and Commentaries, New York, USA: Harper and Row.

[সেন] Sen, Sukumar (1979), Women's Dialect in Bengali, Calcutta, India: Jijnasa.

সিকদার, সৌরভ (২০০২), ভাষাবিজ্ঞানের ভূমিকা ও বাংলা ভাষা, ঢাকা:অনন্যা।

সেনগুপ্ত, মল্লিকা (১৯৯৪), স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ, কলকাতা:আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

সিকদার, সৌরভ ও সালমা নাসরীন (২০০৯), বাংলা ভাষায় নারী শব্দাভিধান , ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

[হকেট] Hocket, Charles F (1968), A Course in Modern Linguistics, New York, USA: The Macmillan Co.

[হার্টসক] Hartsock, Nancy (1987), 'Foucault on Power: A Theory of Women?', in Monique Lejnaar (ed.), The Gender of Power, Leiden, Netherlands: University of Leiden, pp. 187-206.

হোসেন, শওকত আরা (১৯৯৯), মুক্তিযোদ্ধা ও নারী, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

হোসেন, সেলিনা ও মাসুদুজ্জামান (সম্পাদিত) (২০০৬), জেন্ডার বিশ্বকোষ, প্রথম খন্ড, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

হুমায়ুন, রাজীব (১৯৮৫), সমাজভাষা বিজ্ঞান, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।